# অধ্যায় ১ গণপরিষদ ও ভারতীয় সংবিধান [Constituent Assembly and the Constitution of India]

অধ্যায়সূচী

// ① গণপরিষদের ধারণা ② গণপরিষদ গঠনের পটভূমি ③ গণপরিষদের গঠন ④ গণপরিষদের প্রকৃতি ও কার্যাবলী ⑤ গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা ⑥ গণপরিষদের ভূমিকা—একটি পর্যালোচনা //

## ১.১ গণপরিষদের ধারণা (The Concept of Constituent Assembly)

ভারতের বর্তমান সংবিধান ভারতীয় গণপরিষদের সৃষ্টি। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে একটা দেশের শাসনব্যবস্থা সেই দেশের অধিবাসীদের দ্বারা রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু দেশবাসীর সকলের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকজনকে নিয়ে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থাই দেশ ও দেশবাসীর জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। এই সংস্থাটিকে গণপরিষদ বলা হয়ে থাকে। দেশের জনগণের হয়ে যাঁরা সংবিধান রচনা করেন সম্মিলিতভাবে তাঁদের গণপরিষদ বলা হয়।

**নেহরুর মত** // পণ্ডিত নেহরু গণপরিষদের এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করেন না। তাঁর মতানুসারে গণপরিষদের এই ধারণা তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরিপূর্ণ অর্থে গণপরিষদের ধারণা ব্যাপকতর। দেশবাসীর জীবনধারায় একটি নতুন জীবনপদ্ধতির সংহিতা যে জনপ্রতিনিধিরা প্রণয়ন করেন তাঁদের একত্রে গণপরিষদ বলে। এই গণপরিষদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য আছে। গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত জাতির জীবনপদ্ধতির এই সংহিতা বা সংবিধানে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিন্তা-চেতনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। এই সংবিধান হয়ে দাঁড়ায় জনসাধারণের জীবনবেদ।

## ১.২ গণপরিষদের গঠনের পটভূমি (Background of the Composition of the Constituent Assembly)

ভারতীয় গণপরিষদের ধারণা সুদীর্ঘকাল ধরে গর্ভাবস্থায় ছিল। ভারতীয় গণপরিষদের উদ্ভবের ইতিহাস ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি ও ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে-কোন দেশের জন্য সংবিধান রচনার কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের একটি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্ব-রাজ বা স্বাধীনতার অন্যতম অঙ্গ ছিল গণপরিষদ গঠনের দাবি। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিতে এই দাবি পূরণ হয়েছে। ভারতীয় গণপরিষদ ব্রিটিশ সরকারের অনুদান হিসাবে আসে নি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয়দের নিয়ে ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের দাবি। এই কারণে গণপরিষদের গঠন সম্পর্কে আলোচনার আগে এর পটভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার।

১৯০৬ সালে প্রথম ভারতের জন্য পৃথক ও ভারতীয় গণপরিষদের দাবি উত্থাপিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঐ বছর 'স্বরাজ' সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ করে। এই প্রস্তাবের মধ্যেই গণপরিষদের দাবি নিহিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রগতিশীল কিছু রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। তার ঢেউ ভারতেও এসে পড়ে। সমকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা সেই প্রচারের সূত্রে

Scanned with CamScanner

অনুপ্রাণিত হন। তাঁরা পৃথক ভারতীয় গণপরিষদের দাবি তোলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা এক সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের দাবিতে পরিণত হয়। তারপর থেকেই নিজেদের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অধিকার অর্জনের জন্য দাবি উঠতে থাকে। এই দাবি কখনও প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনও পরোক্ষভাবে উত্থাপন করা হয়।

**গণপরিষদের দাবি ও কংগ্রেস ।।** গান্ধীজী ১৯২২ সালের ৫ই জানুয়ারী ভারতীয় গণপরিষদের অপরিহার্যতা ও অনিবার্যতার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। এরপর স্বরাজ্য দল কেন্দ্রীয় আইনসভার ভিতরে ও বাইরে স্বতন্ত্র সংবিধানের জন্য দাবি জানাতে থাকে। এ ব্যাপারে ১৯২৩ সালে একটি জাতীয় সম্মেলন হয়। বস্তুতঃ মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রথম একটি গণপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত (Mrs. Annie Beasant)-এর উদ্যোগে ১৯২৫ সালে ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভায় 'ভারতের কমনওয়েলথ বিল' (The Commonwealth of India Bill, 1925) উত্থাপিত হয়। এই বিলে ভারতে গণপরিষদের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে মতিলাল নেহেরু একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে ভারতের সংবিধানের একটি খসড়া প্রণয়নের ব্যাপারে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আবেদন জানান হয়। এই আবেদনে বলা হয় যে, সমকালীন ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্য এবং দেশের মুখ্য রাজনীতিক দলগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে এই খসড়া প্রণয়ন করতে হবে।

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে প্রথম সংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ১৯২৮ সালে। একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সহ এই সম্মেলনে যোগ দেয় সমকালীন সকল প্রধান রাজনীতিক দল। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভা, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি, ভারতীয় খ্রীস্টানদের সর্বভারতীয় সভা, দিল্লির সর্বভারতীয় লিবারেল ফেডারেশন এবং স্টেটস্ পিউপিলস কনফারেন্স। এই সর্বদলীয় সম্মেলনের ফলশ্রুতি হল মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট। এটাই হল ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের প্রথম বিস্তারিত খসড়া। এই খসড়ায় কানাডার, অস্ট্রেলিয়ার এবং নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধানকে অনুসরণ করা হয়।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালে 'শ্বেতপত্র' (White Paper) প্রকাশ করে। এইভাবে কেন্দ্রে 'দ্বৈত শাসন' (dyarchy) ও প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা হয়। বৈঠকে শ্বেতপত্রকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি গণপরিষদ একটি সংবিধান রচনা করবে এবং সেই সংবিধানই হবে শ্বেতপত্রের একমাত্র সন্তোষজনক বিকল্প। এইভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম সংবিধান রচনার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সময় স্বরাজ্যপন্থীরা সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের (representatives of all sections) নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠনের দাবি তোলেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের ফৈজপুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেও গণপরিষদ গঠনের পক্ষে কংগ্রেস দৃঢ় প্রস্তাব গ্রহণ করে। পণ্ডিত নেহরু ১৯৩৮ সালে ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেস স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সংবিধান চায়। এই সংবিধান রচনা করবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি গণপরিষদ। এই গণপরিষদ বাহ্যিক হস্তক্ষেপ-মুক্ত হবে। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসেও পূর্ণ স্বরাজ ও একটি গণপরিষদ গঠনের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গণপরিষদ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। তবুও গণপরিষদ গঠনের দাবির সমর্থনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বেই আন্দোলন সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকে।

Scanned with CamScanner

**আগষ্ট ঘোষণা ও ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব** // দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে ব্রিটিশ সরকার ভারত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়। ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট ভাইসরয় একটি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা 'আগষ্ট ঘোষণা' হিসাবে পরিচিত। এই ঘোষণায় সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় যে ভারতের সংবিধান তৈরির বিষয়টি একান্তভাবে ভারতীয়দের নিজস্ব বিষয়। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য ক্রিপ্‌স (Sir Stafford Cripps)-কে ভারতে পাঠান। গণপরিষদের ব্যাপারে ক্রিপ্‌স প্রস্তাব করেন যে যুদ্ধ শেষ হলে ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটি নির্বাচিত সংস্থা গঠন করা হবে। ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা হবে নির্বাচক সংস্থার মোট সদস্যের এক-দশমাংশ। নির্বাচক সংস্থা হিসাবে ভূমিকা পালন করবে প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নকক্ষ। গণপরিষদের সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। দেশীয় রাজ্যগুলিও একই ভিত্তিতে গণপরিষদে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নেয় নি। মুসলিম লীগও পৃথক পাকিস্তান ও স্বতন্ত্র গণপরিষদের দাবিতে অটল থাকে।

**কুপল্যাণ্ড পরিকল্পনা** // ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হল। তখন ব্রিটিশ সরকার কুপল্যাণ্ড (Coupland)-কে ভারতে পাঠান। তিনি ঐক্যমত্যের নীতির ভিত্তিতে একটি ছোট আকারের গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতির বদলে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে এই গণপরিষদ গঠিত হবে। কুপল্যাণ্ড পরিকল্পনা (Coupland Plan)-ও ব্যর্থ হয়।

এরপর ভারতের গণপরিষদ গঠনের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্যাবিনেট মিশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯৪৫ সালের মে মাসে। ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হল ঐ বছর জুলাই মাসে। এই নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের ভরাডুবি হল। শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হল। শ্রমিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত ত্যাগের নীতি ঘোষণা করল। ১৯৪৬ সালে শ্রমিক সরকার ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। এই মিশন পাঠানোর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা।

## ১.৩ গণপরিষদের গঠন (Composition of the Constituent Assembly)

১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ছিল আপসমূলক। এই মিশন অবিভক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে মিশন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকার করে নি। বলা হয় যে এতে গণপরিষদের গঠন বিশেষভাবে বিলম্বিত হবে। মিশন স্থির করে যে গণপরিষদের সদস্যরা সাম্প্রতিক নির্বাচনে গঠিত প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

**চারটি মূল নীতি** // ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে চারটি মূল নীতির ভিত্তিতে ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। এই চারটি মূল নীতি হল: (১) ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদের আসন পাবে। প্রত্যেক প্রদেশ প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একজন করে প্রতিনিধি গণপরিষদে পাঠাবে। (২) গণপরিষদের সকল আসন সাধারণ (অ-মুসলমান ও অ-শিখ), মুসলমান ও শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিভক্ত হবে। (৩) প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে অবস্থিত প্রতিটি সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবে। (৪) দেশীয় রাজ্যগুলিকে ৯৩ জন প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়। গণপরিষদ ও দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থার কথা বলা হয়। পরে গণপরিষদ ও দেশীয়

Scanned with CamScanner

রাজ্যের শাসকদের মধ্যে এক চুক্তি হয়। ঠিক হয় যে পঞ্চাশ শতাংশ সদস্য নির্বাচিত হবে এবং পঞ্চাশ শতাংশ সদস্য মনোনীত হবেন।

১৯৩৬ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি নির্বাচক মণ্ডলী (electoral college) হিসাবে কাজ করে। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সমকালীন ভারতের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মাত্র ২৫ শতাংশের ভোটাধিকার ছিল। শিক্ষাগত ও সম্পত্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে এই ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

**প্রতিনিধিত্বের বিভাজন** // ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা স্থির হয় ৩৮৯ জন। এর মধ্যে ১১টি ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ থেকে আসবেন ২৯২ জন সদস্য। ব্রিটিশ-ভারতের জন্য নির্দিষ্ট এই আসনগুলি আবার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়। মুসলমানদের জন্য ৭৮টি, শিখদের জন্য ৪টি, এবং সাধারণের জন্য ২১০টি আসন নির্দিষ্ট হয়। এ ছাড়া স্থির হয় ৪ জন সদস্য আসবেন চীফ্ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলি (দিল্লী, আজমীর-মারওয়ারা, কুর্গ ও ব্রিটিশ বালুচিস্তান) থেকে। এবং অনধিক ৯৩ জন সদস্য আসবেন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে।

**গণপরিষদে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির আসন নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারিত হয়**

| প্রদেশের নাম | সাধারণ আসনের সংখ্যা | মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন | শিখদের জন্য সংরক্ষিত আসন | মোট |
|---|---|---|---|---|
| মাদ্রাজ | ৪৫ | ৪ | — | ৪৯ |
| বোম্বাই | ১৯ | ২ | — | ২১ |
| উত্তরপ্রদেশ | ৪৭ | ৮ | — | ৫৫ |
| বিহার | ৩১ | ৫ | — | ৩৬ |
| কেন্দ্রীয় প্রদেশসমূহ | ১৬ | ১ | — | ১৭ |
| ওড়িশা | ৯ | ০ | — | ৯ |
| পঞ্জাব | ৮ | ১৬ | ৪ | ২৮ |
| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (NWFP) | ০ | ৩ | ০ | ৩ |
| সিন্ধ | ১ | ৩ | ০ | ৪ |

Scanned with CamScanner

প্রভৃতি।

## ১.৪ গণপরিষদের প্রকৃতি ও কার্যাবলী (Nature and Functions of the Constituent Assembly)

১৯৪৬ সালে যে গণপরিষদ গঠিত হয় তার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

(১) **গণপরিষদের প্রকৃতি** ॥ এই গণপরিষদকে আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌম বলা যায় না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা সামগ্রিকভাবে এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার দ্বারা বিশেষভাবে এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় গণপরিষদ কোন সার্থক বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে আপস-মীমাংসার ভিত্তিতে ব্রিটিশ আইনের দ্বারা এই সংস্থা গঠিত হয়েছে। ভারতীয় গণপরিষদ ব্রিটিশরাজের দ্বারা গঠিত এবং ব্রিটিশ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এই সংস্থাকে কোন বৈপ্লবিক বা সার্বভৌম সংস্থা বলা যায় না। (২) গণপরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তখন মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষের ভোটাধিকার ছিল। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হয় নি। (৩) গণপরিষদ সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বমূলক হয় নি। কারণ, পৃথক পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃত না হওয়ায় মুসলিম লীগের সদস্যগণ গণপরিষদে অংশগ্রহণ করে নি। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, গণপরিষদে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক কোন সম্প্রদায়ের উপর সংবিধানকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এই প্ররোচনামূলক ঘোষণার ফলে মুসলিম লীগের সদস্যগণ পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত ও স্বাধীন হয়। তার ফলে আইনগত বিচারে ভারতীয় গণপরিষদ একটি সার্বভৌম পরিষদে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের সদস্যগণ পাকিস্তানে যোগদান করে। মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল ৭৩ জন। ভারত-

Scanned with CamScanner

বিভাগের পর এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ২৯। এর ফলে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা শতকরা ৮২ ভাগে দাঁড়ায়। তখন গণপরিষদ কার্যতঃ একটি কংগ্রেস পরিষদে পরিণত হয়। কংগ্রেসের এই প্রাধান্যের ফলে সংবিধান রচনাকার্যে সাম্প্রদায়িকতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে নি।

কংগ্রেসীরা উদারনৈতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। তাই সংখ্যালঘু নিশ্চিন্ত ছিল। তা ছাড়া হিন্দুদের প্রাধান্য সত্ত্বেও শিখ, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গণপরিষদে ছিল। আবার আম্বেদকর প্রভৃতি অ-কংগ্রেসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গণপরিষদে সকল শ্রেণী ও মতের প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে। শান্থানাম (K. Santhanam) বলেছেন: "There was hardly any shade of public opinion not represented in the Assembly." ক্যাবিনেট মিশন কেবলমাত্র মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যত্নবান ছিল। এই সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indians), ভারতীয় খ্রীস্টান, তপসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতি। ডঃ এইচ. সি. মুখার্জী ভারতীয় খ্রীস্টানদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইঙ্গ-ভারতীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি (Mr.Frank Anthony) এবং পারসীদের প্রতিনিধি ছিলেন মোদী (Dr. H. P. Modi)।

গণপরিষদ গঠনের পরও জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোন আপস-মীমাংসা হয় নি। কংগ্রেস ও লীগের একত্রে কাজ করার ব্যাপারে কোন রকম সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় নি। ১৯৪৬ সালের ২০শে নভেম্বর ভাইসরয় ওয়াভেল ঘোষণা করলেন যে, ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটেনের এক সরকারী ঘোষণায় বলা হল যে এই গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান গণপরিষদে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক কোন সম্প্রদায়ের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এর ঠিক তিন দিন পরে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসল।

**গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন** // ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীর 'কনষ্টিটিউশন হলে' সকাল ১১টায় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে ২০৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে কংগ্রেস প্রতীক থেকে নির্বাচিত ৪ জন মুসলমান সদস্যও ছিলেন। মুসলিম লীগের সদস্যরা এই অধিবেশনে আসেন নি। তাঁরা পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে অনড় থাকেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে সভার কাজ শুরু হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জে. বি. কৃপালনীর প্রস্তাবক্রমে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সচ্চিদানন্দ সিংহকে (Dr. Sachchidananda Sinha) গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি করা হয়। ডঃ সিংহ ছিলেন প্রবীণতম সদস্য। ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১২ই ডিসেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি হল 'সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কিত কমিটি' (The Committee on Rules of Procedure)। ১৩ই ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থের কথাও উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবগুলি ২২শে ডিসেম্বর অনুমোদিত হয়। কে. এম. মুন্সী 'কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত কমিটি'র প্রতিবেদন ২১শে ডিসেম্বর সভায় পেশ করেন। প্রথম অধিবেশন শেষ হয় ২৩শে ডিসেম্বর।

**দ্বিতীয় অধিবেশন** // ১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশন ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। এই সময় কতকগুলি কমিটি গঠিত হয়। এই সমস্ত কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; কার্যনির্বাহক কমিটি (Steering Committee), কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কিত কমিটি, মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটি এবং

Scanned with CamScanner

সংখ্যালঘু সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি প্রভৃতি। তা ছাড়া এই অধিবেশনে গণপরিষদের সহ-সভাপতি হিসাবে হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হয়।

**তৃতীয় অধিবেশন** // প্রথম দুটি অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। কারণ, তখনও পর্যন্ত মুসলিম লীগের অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে না। পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল। এই অধিবেশন চলে ২রা মে পর্যন্ত। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কিত কমিটি, মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটি এবং সংখ্যালঘু সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং সেই প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই অধিবেশনেও কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়। তার মধ্যে দুটি কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি কমিটি হল: কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি (Union Constitution Committee) এবং প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি (Provincial Constitutional Committee)। প্রথম কমিটির সভাপতি করা হয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এবং দ্বিতীয় কমিটির সভাপতি করা হয় সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলকে।

সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে অধিকতর সাবলীল করার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। এই কারণে গণ-পরিষদ কতকগুলি কমিটি গঠন করে। বিভিন্ন বিষয় গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করার জন্য কমিটিগুলি গঠন করা হয়। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সংবিধান, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা, প্রাদেশিক সংবিধান, মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু, তফসিলী উপজাতি, তফসিলী অঞ্চল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত কমিটিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের মধ্যে উল্লিখিত কমিটিগুলির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীকালে খসড়া কমিটি অন্যান্য কমিটির সুপারিশসমূহ বিচার-বিবেচনা করে।

**চতুর্থ অধিবেশন** // ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুলাই পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন স্থায়ী হয় ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। ২২শে জুলাই ভারতের পতাকার পরিকল্পনা স্থির করা হয়। বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে এই অধিবেশনে আলোচনা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটির প্রতিবেদন এই অধিবেশনে পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের মূল নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তা ছাড়া মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু উপজাতি প্রভৃতি সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটিগুলির প্রতিবেদন এই অধিবেশনে পেশ করা হয়।

**ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর** // ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন (Lord Louis Mountbatten) ভাইসরয় পদে যোগ দেন। তিনিই হলেন ভারতের শেষ ভাইসরয়। দায়িত্ব গ্রহণের ছ'সপ্তাহের মধ্যে তিনি একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা হিসাবে তা পরিচিত। এই পরিকল্পনার ফল হল ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর। মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ঘোষণা করলেন যে ব্রিটেন ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের হাতে। ২৬শে জুলাই-এর আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে পাকিস্তানের জন্য পৃথক একটি গণপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর ও ডোমিনিয়ন ভারতের উদ্বোধনের জন্য ভারতের গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে এই অধিবেশন বসে। ভারত সরকারের পক্ষে গণপরিষদ ক্ষমতা গ্রহণ করে।

দেশ বিভাগ ও পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যসংখ্যার কিছু পরিবর্তন ঘটে। নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের জন্য এই পরিবর্তন হয়। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ থেকে নির্বাচিত মুসলিম লিগের সদস্যরা সরে যায়। মুসলিম লিগের

Scanned with CamScanner

মাত্র ২৮ জন সদস্য গণপরিষদে যোগদান করে। এই সময় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি বাদে গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা ২৯৬ থেকে হ্রাস পেয়ে হয় ২২৯। এর মধ্যে কংগ্রেসের ১৯২, লীগের ২৯, অকালীর ১ এবং অন্যান্য ৭ জন সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের ফলশ্রুতি হিসাবে গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩৮৯ থেকে হ্রাস পেয়ে হয় ৩০৮।

**গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব** ।। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চম অধিবেশনের সময় থেকে ভারতের গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদের মর্যাদা লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুসারে ভারতীয় গণপরিষদ এই ক্ষমতা ও মর্যাদা পায়। ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রণীত হয়। তা ছাড়া ভারতের শেষ বড়লাট মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর ২৬শে জুলাই-এর ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে ভারত ও পাকিস্তান উভয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদ প্রয়োজন মনে করলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত যে-কোন আইন বাতিল করতে এবং যে-কোন ধরনের সংবিধান গ্রহণ করতে পারবে। প্রথম অধিবেশন বসার সময় গণপরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। তখন পরিষদের কার্যাবলী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস হওয়ার পর ভারতীয় গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে। এই পঞ্চম অধিবেশন থেকে ভারতীয় গণপরিষদকে সংবিধান রচনা ছাড়াও দেশের আইনসভা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে হয়।

**পঞ্চম অধিবেশন** ।। গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে। এই অধিবেশন স্থায়ী হয় ২৯শে আগষ্ট পর্যন্ত। এই অধিবেশনের শুরুতেই মাউন্ট ব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এই অধিবেশনে বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলাপ-আলোচনা করা হয়। এই সমস্ত কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কিত কমিটি, সংখ্যালঘু সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি প্রভৃতি। তা ছাড়া একটি বিশেষ কমিটি সংবিধান প্রণয়ন ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে গণপরিষদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে। তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে এখন থেকে গণপরিষদ সংবিধান রচনার সঙ্গে সঙ্গে আইনসভা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবে। আরও বলা হয় যে আইনসভা হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদনের সময় পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করবেন একজন অধ্যক্ষ (Speaker)। তিনি সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন জি. ভি. মাভলঙ্কর। সুতরাং স্বাধীন ভারতের প্রথম পার্লামেন্ট (Dominion Legislature) হল গণপরিষদ। গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়ন ও আইনসভার দায়িত্ব সম্পাদন করত স্বতন্ত্র দিনগুলিতে। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন রাজেন্দ্র প্রসাদ; আইনসভার দায়িত্ব সম্পাদনের সময় সভাপতিত্ব করতেন স্পীকার মাভলঙ্কর। গণপরিষদের এই দ্বিবিধ ভূমিকা অব্যাহত ছিল ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর অবধি। কারণ ঐ দিন সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়।

ভারতীয় গণপরিষদ প্রথম ডোমিনিয়ন আইনসভা হিসাবে কাজ করে ১৯৪৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। একটি খসড়া তৈরী করার জন্য এই অধিবেশনে ২৯শে আগষ্ট তারিখে একটি খসড়া কমিটি (Drafting Committee) গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি করা হয় বি. আর. আম্বেদকর (Dr. B. R. Ambedkar)-কে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে. এম. মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ শাহদুল্লা, বি. এল. মিত্র এবং ডি. পি. খৈতান। খসড়া কমিটি গঠিত হওয়ার কিছুদিন বাদেই বি. এল. মিত্রের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। তাঁর জায়গায় এন. মাধব রাউ-কে সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ডি. পি. খৈতানের মৃত্যু হয়। তাঁর জায়গায় টি. টি. কৃষ্ণমাচারী সদস্য নির্বাচিত হন। গণপরিষদ

Scanned with CamScanner

এই মর্মে খসড়া কমিটিকে নির্দেশ দেয় যে কতকগুলি ক্ষেত্রে যেন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করা হয়।

ভারতের সংবিধানের প্রথম খসড়াটি প্রণয়ন করা হয় ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। এই খসড়াটি তৈরি করে গণপরিষদের কর্মদপ্তরের উপদেষ্টা শাখা। এটি তৈরি করার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র বা সাংবিধানিক উপাদন সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত কাগজপত্রের মধ্যে ছিল ৬০টি দেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। সংগৃহীত এই সমস্ত উপাদানকে 'সাংবিধানিক নজির' এই শীর্ষ নামে চিহ্নিত করে তিনটি সিরিজে গণ-পরিষদের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গণপরিষদের প্রথম ছ'টি অধিবেশন চলেছে সাকুল্যে ৫৭ দিন ধরে। এই সময়ে সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সরাসরি সংবিধান রচনার কাজ তখন করা হয় নি। পরের ছ'টি অধিবেশন চলেছে সাকুল্যে ১১০ দিন। এই সময় খসড়া সংবিধানের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে এবং গণপরিষদ সংবিধান রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

খসড়া কমিটি ১৯৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর খসড়া সংবিধান সম্পর্কে কাজ শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কার্য সম্পন্ন হয়। জনমত যাচাই করার জন্য খসড়াটি দেশের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। এবং গণপরিষদের কাছে খসড়া সংবিধান পেশ করা হয় ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। সংবিধানের এই খসড়ায় ৩১৫টি ধারা ও ১৩টি তপসিল ছিল। খসড়াটি সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনা ও সংশোধনী পেশ করার সুযোগ জনগণকে দেওয়া হয়। তার জন্য আট মাস সময় দেওয়া হয়। খসড়া সংবিধানের উপর মোট ৭,৩৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব আসে। তার মধ্যে ২,৪৭৩টি সংশোধনী নিয়ে গণপরিষদে আলোচনা করা হয়। বহু প্রস্তাব, মন্তব্য, সমালোচনা ও সুপারিশসমূহ সংশোধনের জন্য গ্রহণ করা হয়। সেগুলি খসড়া কমিটিতে বিচার-বিবেচনা করা হয়। প্রাপ্ত সমালোচনা, সুপারিশ ও মন্তব্য এবং সে সমস্ত বিষয়ে খসড়া কমিটির মতামত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার উদ্দেশে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রস্তাবসমূহ পুনরায় খসড়া কমিটির কাছে আসে। এই পর্যায়ে বেশ কিছু সংশোধনী গ্রহণ করা হয়।

গণ-পরিষদে ১৯৪৮ সালের ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত খসড়া সংবিধানের প্রতিটি ধারা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা হয়। প্রস্তাবনা অংশটি সবশেষে গ্রহণ করা হয়। তারপর আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ খসড়া কমিটি পাস করে এবং চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হয়। এই চূড়ান্ত খসড়াটি গণপরিষদে পেশ করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৬ই নভেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় পাঠ শেষ হয়। সভায় পরের দিনই তৃতীয় পাঠ শুরু হয়। আম্বেদকর প্রস্তাব করেন যে, গণপরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত সংবিধান গ্রহণ করা হোক। প্রস্তাবটি ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্তভাবে ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তপশীল অনুমোদিত হয়। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখেই গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাক্ষর করেন।

এই সংবিধান রচনা করতে সময় লেগেছে মোট ২ বছর ১১মাস এবং ১৭ দিন, অর্থাৎ প্রায় ৩ বছর। গণপরিষদের মোট ১১টি অধিবেশন হয়েছিল। এবং এই অধিবেশনগুলি সাকুল্যে ১৬৫দিন ধরে চলেছে।

শেষ অধিবেশন ।।। গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে। সদস্যগণ সংবিধানে স্বাক্ষর করেন গণপরিষদের এই শেষ দিনে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচারে খরচ হয়েছে ৬৪ লক্ষ্য টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে সংবিধান রচনা ছাড়াও গণপরিষদ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছে। এগুলি হল: (১) ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই জাতীয় পতাকা গ্রহণ করে;

Scanned with CamScanner

(২) ১৯৪৯ সালের মে মাসে কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে; (৩) ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করে; (৪) ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে এবং (৫) গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সংবিধি (statute) গ্রহণ করে। এই অধিবেশনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নির্বাচিত করা হয়। এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান সামগ্রিকভাবে কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে। পঞ্চম অধিবেশনের পরের দিনই গণপরিষদের আয়ু শেষ হয়ে যায়নি। অস্থায়ী (Provisional) পার্লামেন্ট হিসাবে পরিষদ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-'৫২)-এর পর নতুন পার্লামেন্ট গঠিত হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যায়। তবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার (২৬.১১.১৯৪৯) অব্যবহিত পরে সংবিধানের কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হয়েছে। যেমন উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে রেজিস্ট্রিকরণের স্বার্থে নাগরিকতা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থাকে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারি তারিখটি বর্তমানে সাধারণতন্ত্র দিবস (Republic Day) হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৩০ সালে এই ২৬শে জানুয়ারি তারিখে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছিল।

## ১.৫ গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Constituent Assembly)

ভারতীয় গণপরিষদের গঠন ব্যবস্থা ও কার্যপদ্ধতি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়।

**(১) জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় নি** // ভারতীয় গণপরিষদকে জনগণের প্রতিনিধিপুষ্ট পরিষদ বলা যায় না। কারণ এই পরিষদ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নি। গণপরিষদ সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরাই গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছেন। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন সমকালীন ভারতের শতকরা ১৪ ভাগ মানুষের দ্বারা। কারণ তখন মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশের ভোটাধিকার ছিল। গণপরিষদে ভারতের সকল অংশের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল না। তাই এই পরিষদে সকল শ্রেণীর মানুষের সবরকম মতামত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি। তাই গণপরিষদের অন্যতম সদস্য দামোদরস্বরূপ শেঠ দাবি করেছিলেন যে জনগণের মাত্র ১৫ শতাংশের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এই পরিষদ সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কিন্তু এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

**(২) উচ্চবিত্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব** // অনেকের মতে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিয়েই এই গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল। এখানে রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটেছিল। সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জমিদার, আইনবিদ্ ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ্‌দের সুস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা এখানে মর্যাদা পায় নি। ভারতীয় গণপরিষদের গঠনব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব (elite domination)-এর ধারণা কাজ করেছে।

**(৩) সামন্ততন্ত্রের ছায়া** // দেশীয় নৃপতিদের হাতে গণপরিষদের ৯৩ জন সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা ছিল। রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরোধী। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় গণপরিষদের গঠনব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের এক অভিনব আপসরফার মাধ্যমে রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**(৪) গণসমর্থন নেওয়া হয়নি** // এই পরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান সম্পর্কে জনমত যাচাই করা হয় নি। রচিত সংবিধানটিকে গণভোটে পেশ করা হয় নি। তাই এই সংবিধানকে জনগণের সংবিধান বলা যায় না।

**(৫) সকল দলের প্রতিনিধি ছিল না** // সকল দলের সরকারী প্রতিনিধি এই গণপরিষদে

Scanned with CamScanner

ছিল না। হিন্দু মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল এবং কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রতিনিধি এই পরিষদে ছিল না। সোমনাথ লাহিড়ী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে তাঁকে সদস্যপদ হারাতে হয়।

(৬) **পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা** ∫∫ জোহারীর মতানুসারে, গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া আলোচনার সময় পুরোপুরি সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এবং খসড়া প্রস্তাবসমূহ সরকারী বিলের মতোই গুরুত্ব পেয়েছে। তা ছাড়া, সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল করার ব্যাপারে সভাপতির পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল। তার ফলে সাধারণ সদস্যরা নিজেদের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ পান নি।

(৭) **আইন ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য** ∫∫ গণপরিষদে আইনবিদ্‌দের পরিপূর্ণ প্রাধান্য ছিল। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে কার্যত ২১ জন সদস্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ১১ জনই ছিলেন আইনজ্ঞ পণ্ডিত। আম্বেদকর, আয়ার, মুন্সী প্রভৃতি আইনবিদের নিয়ে গঠিত খসড়া কমিটি পরিষদের উপর কর্তৃত্ব করেছে। আইনজ্ঞরা সংবিধানের মূলতঃ আইনগত খুঁটিনাটি বিষয়াদির বিচার-বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেবলমাত্র আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেই আর্থ-সামাজিক সমস্যাদির সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। তার ফলে ভারতীয় সংবিধান 'আইন ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য' (lawyers paradise)-এ পরিণত হয়েছে।

(৮) **বৌদ্ধিক স্বৈরাচার** ∫∫ গণপরিষদের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এক ধরনের 'বৌদ্ধিক স্বৈরাচার' (intellectual autocracy)-এর সৃষ্টি হয়েছিল। গণপরিষদের কার্যধারায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্যের সুস্পষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার গভীর যোগাযোগ ছিল। তাঁদের চিন্তাচেতনা ছিল পাশ্চাত্ত্যমনস্ক। এঁদের সঙ্গে গণপরিষদের সাধারণ সদস্যদের এক বিরাট 'ধারণাগত ফাঁক' (understandability gap)-এর সৃষ্টি হয়। গণপরিষদের সাধারণ সদস্যরা আম্বেদকর, আয়ার, মুন্সী প্রমুখ প্রথিতযশা আইনবিদ্‌দের সঙ্গে সমপর্যায়ের আলোচনা চালাতে পারতেন না। এর ফলে গণপরিষদের কার্যধারায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

(৯) **খসড়া কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ** ∫∫ খসড়া কমিটির (Drafting Committee) ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। এই কমিটি খসড়া-সংবিধান আলোচনার প্রাক্কালে বার বার তার মত বদলেছে এবং যখন তখন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এই সমস্ত প্রস্তাব নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত আকারেও তোলা হয়েছে। তার ফলে পরিষদের সাধারণ সদস্যরা এই সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পান নি। একজন সদস্য খসড়া কমিটিকে তির্যকভাবে 'Drifting Committee' বলে উপহাস করেছেন।

তাছাড়া খসড়া কমিটির এক্তিয়ার নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। এই কমিটি নিজেকে একটি 'স্থায়ী কমিটি' (Select Committee) ও 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' (Expert Committee) হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। এই কমিটির ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে কারও কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই কমিটি খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে, সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, সাধারণ সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রভৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে সংবিধান গৃহীত হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করে গেছে।

(১০) **আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ** ∫∫ খসড়া কমিটির সভাপতি আম্বেদকরের বিরুদ্ধেও অনেকে অভিযোগ তুলেছেন। আম্বেদকরের উপরওয়ালা-সুলভ (bossism) আচরণে অনেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। গণপরিষদের সাধারণ সদস্যদের আইন সংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে আম্বেদকর প্রায়শই বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বস্তুতঃ গণপরিষদ একটি আলোচনা সভার পরিবর্তে আইন কলেজের শ্রেণীকক্ষে পরিণত হয়েছিল। কে. ভি. রাও (K.V.Rao)-এর মতানুসারে গণপরিষদের সদস্যদের আম্বেদকর তাঁর ছাত্র হিসাবে গণ্য করতেন। সব বিষয়ে তিনি শেষ



Scanned with CamScanner

কথা বলার অধিকারী ছিলেন। পরিষদের একজন সদস্যের মতানুসারে আম্বেদকর ধরে নিয়েছিলেন যে সাধারণ সদস্যদের কোন ভূমিকা নেই।

**(১১) চার কংগ্রেস নেতার কর্তৃত্ব** ∫∫ প্রকৃত বিচারে সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষমতা ডঃ আম্বেদকর বা খসড়া কমিটির হাতেও ছিল না। গণপরিষদে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেছেন নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ। খসড়া কমিটি এঁদের সিদ্ধান্তকেই কার্যকর করেছে। গণপরিষদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ছিল আটটি। এরকম প্রতিটি কমিটির সভাপতি পদে নেহরু, প্যাটেল বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে কোন-না-কোন একজন আসীন ছিলেন। সরকার ও দলের মধ্যে এঁদের নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ছিল। তাই তাঁরা গণপরিষদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

**(১২) কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রাধান্য** ∫∫ জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শই ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ, লক্ষ্য ও দর্শনে পরিণত হয়েছে। কারণ গণপরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে গণপরিষদ একটি কংগ্রেস পরিষদে পরিণত হয়েছিল। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যে-কোন আলোচনা-সমালোচনা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ (whip) জারি করত। মহাবীর ত্যাগীর মতানুসারে খসড়া কমিটির সদস্যদের হাত অন্যত্র বাঁধা ছিল।

(১৩) গণপরিষদে জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে নি। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে আইনজ্ঞ রাজনীতিবিদ্‌দের প্রাধান্য ঘটেছিল। তাই এই সংবিধান কেবলমাত্র আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত হয়েছে। গণপরিষদে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের অনুপস্থিতি ক্ষতিকারক হয়েছে। তার ফলে ভারতের সংবিধান একটি রাজনৈতিক দলিলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু আর্থ-সামাজিক গণতন্ত্রের সনদ হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে নি।

**(১৪) হিন্দুদের প্রাধান্য** ∫∫ সমালোকদের মধ্যে একটি অংশ এমন অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, গণপরিষদ ছিল হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত একটি সংঘ। উইস্টন চার্চিল মন্তব্য করেছেন যে গণপরিষদ ভারতের একটি বৃহৎ জনসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। লর্ড ভিসকাউন্ট সাইমন (Lord Viscount Simon) গণগপরিষদকে বলেছেন: ''a body of Hindus''.

**(১৫) বিশেষ স্বার্থের সংরক্ষণ** ∫∫ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে ব্রিটিশরাজ মূলতঃ তিনটি গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। এক্ষেত্রে ইংরেজদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ও সম্পত্তি, ব্রিটিশ, I.C.S.-দের স্বার্থ ও দেশীয় নৃপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা উল্লেখযোগ্য। ভারতের মূল সংবিধানে এই তিনটি গোষ্ঠীর মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থাদির বিলোপ সাধন করা হয়েছে।

**মূল্যায়ন (Evaluation)** ∫∫ কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতে উপরিউক্ত সমালোচনাগুলি সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। উল্লিখিত সমালোচনাসমূহের জবাবী বক্তব্য হিসাবেও বহু কথা বলার আছে।

**এক,** সেই সময় দ্রুত এবং স্থায়ী একটি রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আশু প্রয়োজন। এই কারণে বহু তথাকথিত শুদ্ধ তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করা যায় নি।

**দুই,** সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কংগ্রেসের এই নেতারাই ছিলেন সমকালীন ভারত ও ভারতবাসীর অবিসংবাদিত নেতা। পরবর্তী কালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে তাঁরাই দেশ শাসনের ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন।

**তিন,** গণপরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের সুবাদে বিশ্বের একটি বৃহত্তম সংবিধান সত্বর রচনার পথ সুগম হয়েছে। গণপরিষদে দল হিসাবে কংগ্রেসের একক প্রাধান্যের

Scanned with CamScanner

কারণে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি সংবিধান রচনার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

**চার,** আবার গণপরিষদে হিন্দু মহাসভা, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট দলের কোন সরকারী সদস্য ছিলেন না, এ কথা ঠিক। কিন্তু এতে কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ এই সমস্ত দলের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করার এবং কর্মসূচী পেশ করার মত বহু সদস্য কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন। কংগ্রেস দলের মধ্যেই প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল প্রভৃতি সকল রকম দৃষ্টিভঙ্গীর সদস্য ছিলেন। তাঁরা বহু ও বিভিন্ন ধরনের মতামত উপস্থিত করেছেন।

**পাঁচ,** অস্টিনের মতানুসারে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কার্যক্রম সময়সাপেক্ষ ও জটিল হত। তাই কংগ্রেস গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি মেনে নিয়েছিল।

**ছয়,** গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানের পিছনে গণসমর্থন যাচাই করার জন্য তা গণভোটে পেশ করা হয়নি। অনেকের মতে এর কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই সংবিধানের পিছনে ব্যাপক গণসমর্থন থাকবে। কারণ এই সংবিধান রচিত হয়েছে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এঁরা ছিলেন সমকালীন ভারতের অবিসংবাদিত জননেতা।

**সাত ঃ** ভারতের সংবিধান বিশেষ কোন মতাদর্শের বা দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে প্রণীত হয়নি। এই সংবিধান প্রণয়নে কর্তৃত্ব করেছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত নেতারা। এঁরা ছিলেন বিশেষভাবে উদারপন্থী।

**আট ঃ** সংবিধান প্রণেতারা নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও দেশবাসীর সর্বোচ্চ স্বার্থে ভূমিকা পালন করেছেন। সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভারত ও ভারতবাসীর সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## ১.৬ গণপরিষদের ভূমিকা—একটি পর্যালোচনা (Role of the Constituent Assembly—A Reflection)

স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে সংবিধান প্রণয়ন হল একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিবিধ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। গণপরিষদের সভায় আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণীত হয়েছে। এই সংবিধানের মাধ্যমে অতীতের রাজনীতিক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে এবং একটি নতুন শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত ভারতে রাজনীতিক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক বিভাজন, ব্যাপকভাবে অধিবাসীদের স্থানান্তরিতকরণ, অমানবিক উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সংবিধান রচয়িতারা প্রণীত সংবিধানের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে সমন্বয়সাধনের ও খাপ খাইয়ে মানিয়ে চলার প্রবণতা প্রকাশ করেছেন এবং নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইনের অনুশাসনের প্রতি অঙ্গীকার অভিব্যক্ত করেছেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় উদারনীতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভাজনের মানসিক আঘাতের কারণে সংবিধানে কেন্দ্রিকতার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের গণপরিষদ কাজ শুরু করেছে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর এবং ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী গণপরিষদে সংবিধানটি পাস হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিন বছরের থেকে সামান্য বেশী সময়ব্যাপী গণপরিষদ কাজ করেছে। সমকালীন পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল ছিল বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিকূল। ভারতের অঙ্গব্যবচ্ছেদের কারণে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ অচিরে বিষাদে পরিণত হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড জাতীয় শোকের সৃষ্টি করেছিল। অমানবিক উদ্বাস্তু সমস্যা, নিষ্ঠুর জাতিদাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের অকাল প্রাণহানি প্রভৃতি সমগ্র

Scanned with CamScanner

পরিস্থিতিকে বেদনাবিদুর ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এ রকম এক প্রতিকূল পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল আশা-আকাঙ্খা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবর্তে বিষাদ-বিহ্বল প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের সংবিধান ছিল বিদ্যমান বিরূপ বাস্তবতার প্রতি এক সদর্থক প্রতিক্রিয়া। গণপরিষদের সদস্যরা বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিকূলতার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে নিজেদের আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা পরিচালিত হননি। তাঁরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

সামগ্রিক বিচারে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি ছিল বিশেষভাবে কষ্টসাধ্য। ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতিকূলতা ত' ছিলই, তা ছাড়া ছিল সামাজিক বাস্তবতার অতি জটিল বিন্যাস। এসব কিছুকেই সংবিধানের সামিল করার তাগিদ ছিল। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে হিংসাশ্রয়ী ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাহাঙ্গামায় অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। গণপরিষদের সদস্যরা এ রকম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে রক্ষণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সংবিধান প্রণেতারা অখণ্ড জাতীয় জীবনের স্বকীয় ধারণার দ্বারা বস্তুত আবিষ্ট ছিলেন। তদনুসারে তাঁদের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল একটি উপযুক্ত সুশৃঙ্খল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা।

ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংবিধান। স্বাধীন ভারতের সকলের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না; বরং বিশেষভাবে দুরূহ দায়িত্ব ছিল। ভারতের গণপরিষদ এই দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছে। সংবিধান প্রণেতাদের বিবিধ সমস্যা-সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

(১) ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেশবাসীর মধ্যে অত্যুচ্চ আশা-আকাঙ্খা সঞ্চারিত করেছিল। আমজনতার মধ্যে ত' বটেই বিশে ত তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিসমূহ এবং অন্যান্য অনগ্রসর জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে স্বাধীন ভারতের এক সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনচিত্র চিত্রিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের সীমাহীন আশা-আকাঙ্খা সম্পূর্ণ করার মত সহায়ক সাংবিধানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা মোটেই সহজ-সাধ্য ছিল না।

(২) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে ত'বটেই, অন্যান্য অধিকাংশ জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের চেতনা ছিল সদা জাগ্রত। তাঁরা স্বাধীন ভারতে বিকশিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে দৃঢ়মনস্ক ছিলেন। অথচ সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনী রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণের বিষয়টি সমস্যা হিসাবে সামনেই ছিল। নেহরু ও তাঁর অনুগামীদের মননের বিকশিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূঢ় বাস্তবতার বিস্তর ব্যবধান ছিল।

(৩) মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারত কিন্তু একটি সমজাতীয় বা সমরূপ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে নি। মোট মুসলমান জনসংখ্যার দশ শতাংশের অধিক ভারতে থেকে গেছিল। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(৪) সুবিশাল এই ভারতভূমিতে বহু ও বিভিন্ন জনসম্প্রদায় বসবাস করে। তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী, তাদের ধর্মবিশ্বাসে বিস্তার পার্থক্য, তাদের ঐতিহ্য আলাদা এবং তাদের জীনধারা ও রীতিনীতি স্বতন্ত্র। সুতরাং ভারতের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে ব্যাপক বৈচিত্র্য বর্তমান। এ রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জনসম্প্রদায় ও নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তারজন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করতে

Scanned with CamScanner

হবে। অথচ দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। স্বভাবতই বিষয়টি সহজসাধ্য ছিল না।

(৫) স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়। ভারতবিভাগের পর পঞ্জাব ও বাংলার অঙ্গহানি ঘটে। এইসব ঘটনা সমকালীন জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে হতাশা সঞ্চারিত করে। কারণ তাঁরা স্বাধীন ভারতে সুদৃঢ় এক সরকারী ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে জনমনে বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে অতিমাত্রায় আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাবলীর মানসিক আঘাত নেতৃবৃন্দকে হতচকিত করে দেয়। পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল জটিল হয়ে পড়ে।

(৬) দেশীয় নৃপতিশাসিত রাজ্যসমূহকে নিয়ে দুর্ভাবনার অবধি ছিল না। এরকম রাজ্যের সংখ্যা ছিল পাঁচশ'রও অধিক। এই রাজ্যগুলি অবজ্ঞামূলক বিরোধিতার অবস্থান গ্রহণ করেছিল, এমন নয়। কিন্তু কয়েকটি রাজ্য উভয়বলতার কৌশল গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং জুনগড়ের নাম করা যায়। এই সমস্ত রাজ্যকে ভারতের রাজনীতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে নেতাদের বিবিধ প্রকারের উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত ছিল না।

(৭) ভারতের সংবিধান রচয়িতারা এক জটিল পরিস্থিতি ও গোলোকধাঁধার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা অসংখ্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পরস্পরবিরোধী দাবীদাওয়ার মুখোমুখী হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান সমস্যার সোজাসাপটা সমাধান সম্ভব ছিল না।

উপরিউল্লিখিত সমস্যাদি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান রচয়িতারা অনন্যোপায় হয়ে এক অতিদীর্ঘ এবং সর্বোন্তর্ভুক্তিমূলক সংবিধান প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সংবিধানে সাবেকি শাসনতান্ত্রিক বিষয়াদি, যেমন, কেন্দ্রের ও রাজ্যস্তরের সরকারের তিনটি বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আবার রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মত অচিরাচরিত বিষয়াদিও সংবিধানের সামিল করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সংবিধান প্রণেতারা ভারতের সংবিধানকে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধনের একটি হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে তাঁরা উপনিবেশিক শাসকদের তৈরী করা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ ব্যবস্থাদিকে অতিমাত্রায় অনুসরণ করেছেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের বুনিয়াদি কাঠামোটি গড়ে তোলা হয়েছে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ভিত্তিতে। অবশ্যই এটি একটি অদৃষ্টের পরিহাস যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতারা ভারতের জন্য ইংরেজদের দ্বারা স্থিরীকৃত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেহারা-চরিত্রের সীমানাকে অতিক্রম করে আসতে পারেন নি। তবে তাঁরা বিভিন্ন দেশের সংবিধানের বিশেষত গণতান্ত্রিক সংবিধানসমূহের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলিকে ভারতের সংবিধানে সংযুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্নিহিত দার্শনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। এই তিনটি উপাদান হল : (১) দেশের ঐক্য ও সংহতি (২) গণতন্ত্রের মূলনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং (৩) সামাজিক বৈপ্লবিক উত্তাপ। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে জাতির ঐক্য ও সংহতির মূল্য; গুরুত্বের বিচারে পরবর্তী স্থান পেয়েছে গণতন্ত্রের মূল্য। সবশেষে আসছে সামাজিক বিপ্লবের মূল্য। উপরিউক্ত তিনটি মূল্যই অপরিহার্য এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

সংবিধান রচয়িতারা ভারতের ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তারজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিক ব্যবস্থার অঙ্গচ্ছেদনেও তাঁদের অনীহা ছিল না। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনা ছাড়া কার্যকরি অংশের অন্য কোথাও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কথা তেমনভাবে

Scanned with CamScanner

বলা হয়নি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপক ক্ষমতা এবং অলিখিত স্ববিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে এমন সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, সমগ্র সংবিধানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিষয়টিকে সবকিছুর উপরে রাখা হয়েছে।

সংবিধান রচয়িতারা ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ও আদর্শকে সঞ্চারিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ব্যাপক পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হবে, এই ছিল সংবিধান প্রণেতাদের পরিকল্পনা। একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। এটাই ছিল পরিকল্পিত পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সফল করার চাবিকাঠি। এই সংবিধানিক ব্যবস্থা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ন্যূনতম বুনিয়াদি শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল যে, তারা হল স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক; নিজেদের শাসক বাছাই করার স্বাধীনতা তাদের আছে। ভারতের সমাজব্যবস্থা প্রকৃতিগত বিচারে ঐতিহ্যবাদী এবং আর্থ-সামাজিক বিচারে জনসাধারণের অধিকাংশ অনগ্রসর। এতদ্‌সত্ত্বেও সংবিধানে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থা জনসাধারণকে তাদের পছন্দমত জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছে। সংবিধান রচয়িতারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছিলেন।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা— এই দুটি বিষয়ের পরে তৃতীয় মূল্যবোধ হিসাবে সংবিধানে সংযুক্ত হয়েছে সামাজিক বিপ্লবের নীতি। ভারতে গণতন্ত্রকে অর্থবহ এবং অব্যাহত করার জন্য কতকাংশে সামাজিক বিপ্লবের অপরিহার্যতা এবং অনিবার্যতা সম্পর্কে সংবিধান রচয়িতারা সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। তবে সংবিধান প্রণেতারা সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে; তারপরে স্থান দিয়েছেন গণতন্ত্রকে এবং সবশেষে সামাজিক বিপ্লবকে।

Scanned with CamScanner